بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকিদা

আকিদা বলতে কী বোঝায় তা পরিষ্কার বুঝে নেয়া প্রত্যেকটি মুসলিমের অতি প্রয়োজনীয়। কারণ দীনের সব প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের সম্মিলিত অভিমত এই যে পরিপূর্ণ ঈমান থাকা সত্ত্বেও আকিদার ভুলে একজন মো'মেনের কার্যত মোশরেক ও কাফের হয়ে যাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ একজন মানুষ আল্লাহ, রসুল, কোর'আন, কেয়ামত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, মালায়েক ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ ঈমানদার হয়েও আকিদা ভুল হওয়ার দরুন কার্যত মোশরেক ও কাফের হয়ে যেতে পারে। ঐ সব বিষয়ে ঈমান পূর্ণ হলেও যদি মানুষ মোশরেক ও কাফের হতে পারে তবে অবশ্যই আকিদা ঈমানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বেশি প্রয়োজনীয়। আসলেও তাই, আকিদা ঈমানের চেয়ে সূক্ষ্মতর, কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। তার প্রমাণ বর্তমান দুনিয়ার মুসলিমদের অবস্থা। কোটি কোটি মানুষের মোকাম্মেল ঈমান, আল্লাহ, রসুল, কোর'আন ইত্যাদির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা শেরক ও কুফরের মধ্যে ডুবে আছে, আকিদার ভুলের, বিকৃতির জন্য কিন্তু বুঝতে পারছে না। আকিদা হলো কোনো একটি জিনিস বা ব্যাপার সমগ্রভাবে দেখা বা বোঝা (Comprehensive Concept)। কোনো বস্তু বা পদার্থ হলে সেটির সমগ্রটিকে চোখ দিয়ে দেখে সেটা কী, সেটা দিয়ে কী কাজ হয় এবং সেটার উদ্দেশ্য কী এ সমস্তই সঠিকভাবে বুঝে নেয়া হলো আকিদা এবং কোনো বস্তু বা পদার্থ না হয়ে যদি কোনো বিষয় হয় তবে সেটাকে চোখ দিয়ে নয়, বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা দিয়ে সেটার সামগ্রিক রূপটাকে ধারণা করা, সেটার কাজ কী, সেটার উদ্দেশ্য কী এ সমস্তই সঠিক বুঝে নেওয়া হল আকিদা। অন্যভাবে বলা যায় যে আকিদা হলো দৃষ্টি। বস্তু বা পদার্থ হলে দৈহিক চক্ষু দিয়ে সে জিনিস বা বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখা, আর বিষয় হলে বুদ্ধি, মনের চোখ দিয়ে সামগ্রিকভাবে দেখা ও বোঝা। দুটো উদাহরণের চেষ্টা করছি। প্রথমটা বস্তু। সেই সর্বজনবিদিত অন্ধের হাতি দেখার উপমাটাই নেওয়া যাক। পাঁচ জন অন্ধ, তাদের দৃষ্টিশক্তি নেই বলে হাতড়িয়ে হাতি দেখে পাঁচ জনে হাতি সম্বন্ধে পাঁচ রকম সিদ্ধান্ত করল। যে শুড় হাতড়াল তার কাছে হাতি একটা অজগর সাপের মত, যে পা হাতড়াল তার কাছে থামের মত, যে পেট হাতড়াল তার কাছে জালার মত, যে কান হাতড়াল তার কাছে কুলোর মত, আর যে লেজ হাতড়াল হাতি তার কাছে চাবুকের মত। সবগুলো অভিমতই অবশ্য ভুল। এই ভুলের কারণ মাত্র একটা- সেটা হচ্ছে এ লোকগুলির দৃষ্টিশক্তি নেই তাই তারা চোখ দিয়ে সমস্ত হাতিটাকে সমগ্রভাবে দেখতে পারে না। যদি দৃষ্টি থাকতো তবে সমগ্র হাতিটাকে একবারে দেখতে পেত, হাতি দিয়ে কী হয়, ওটার উদ্দেশ্য কী সবই সঠিক হতো, অর্থাৎ হাতি সম্বন্ধে তাদের আকিদা সঠিক হতো। তাদের হাতড়াবার প্রয়োজনই

হতো না, যেমন বিশ্বনবীর আসহাবদের হাতড়াবার অর্থাৎ ইসলামকে বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন হয় নি। কারণ তাদের আকিদা শেখা ছিল স্বয়ং রসুলের কাছ থেকে।

বস্তু বা পদার্থ না হয়ে কোনো বিষয় হলে তখন দৈহিক চক্ষু না হয়ে প্রয়োজন হবে মস্তিষ্কের, বুদ্ধির, মনের চোখের, যুক্তির চোখের। উদাহরণরূপে ধরুণ আপনাকে চোখ বেঁধে স্টেশনের দাঁড়ানো ট্রেনের একটা বগি অর্থাৎ কামরায় নিয়ে যেয়ে আপনার চোখের বাঁধন খুলে দিলাম। তারপর আপনাকে বোঝালাম এই যে, আপনাকে যেখানে নিয়ে এসেছি এটা একটা বসবাস করার ঘর। এই দেখুন এই যে গদিমোড়া বিছানা, এ যে টেবিল, ইলেকট্রিক বাতি, পাখা, মাথার কাছে পড়ার বাতি, দরজা, জানালা, এই যে পাশেই টয়লেট, পেশাব-পায়াখানা-হাতমুখ ধোয়ার বেসিন, পানি ইত্যাদি বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে। সুতরাং আপনি এখানে সুখে বসবাস করুন। অতি শক্তিশালী যুক্তি। আপনি যদি ঐ যুক্তি শুনে বিশ্বাস করেন যে ট্রেনের ঐ কামরা সত্যই বসবাস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে তবে আপনার আকিদা অর্থাৎ ঐ কামরার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা (Comprehensive Concept) ভুল হলো। বসবাস করার সমস্ত আয়োজন ওখানে থাকা সত্ত্বেও ওটার উদ্দেশ্য বসবাস করার জন্য নয়, ওটার উদ্দেশ্য আপনাকে সিলেট বা চট্টগ্রাম বা দিনাজপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি শুধু ওটাকে আংশিকভাবে দেখছেন বলে বুঝতে পারছেন না ওর আসল উদ্দেশ্য কি। আপনি কামরাটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে খানিকটা দূরে থেকে কামরাটাকে দেখুন। এবার আপনি দেখতে পাবেন ঐ কামরার নিচে চাকা লাগানো আছে অর্থাৎ ওটার চলার জন্য। তারপর আরও একটু দূরে যেয়ে দেখলে সম্পূর্ণ ট্রেন, সেটার ইঞ্জিন, রেলের লাইন সব চোখে পড়বে। এইবার আপনি আপনার বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন যে বসবাস করার সব রকম ব্যবস্থা থাকলেও ঐ কামরার উদ্দেশ্য তা নয়, ওর আসল উদ্দেশ্য হলো আপনাকে দূরে কোনো গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাওয়া। এইবার আপনার আকিদা (Conception) সঠিক হলো। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে, একবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো বস্তু, পদার্থ বা বিষয়কে না দেখে ওগুলোর অংশ বিশেষকে দেখে ওগুলো সম্বন্ধে সঠিক আকিদা করা যায় না। নাট-বল্টু দেখে যেমন কখনও বলা যাবে না যে ওটা কেমন ইঞ্জিনের অংশ, তেমনি কোনো জীবন-ব্যবস্থা, দীনের কোনো অংশ দেখে বলা যাবে না, ওর সমগ্র রূপটি কি, ও উদ্দেশ্য কি। ঠিক ওমনিভাবে ওমুক কাজ করলে অত হাজার সওয়াব লেখা হয়, ওমুক দোয়া পড়লে অত লক্ষ সওয়াব হয় থেকেও ইসলামের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না। অনেকটা এই ভাবেই এই শেষ জীবন-ব্যবস্থা, শেষ ইসলামের প্রকৃত আকিদা লুপ্ত হয়ে গেছে। বসবাসের আসবাবপত্র দেখে ট্রেনের কামরাকে তাই মনে করে সেখানে আরামে বাস করতে থাকলে যা হবে আজ মুসলিম উম্মাহর তাই হয়েছে। আজ তার কোনো গন্তব্যস্থান নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের কামরায় সে বাস করছে। এই আকিদা বিকৃতির মূলে সেই অতি বিশ্লেষণ, সেই ভারসাম্যহীন বিকৃত-সুফিবাদ, সেই সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল পথকে ত্যাগ।

সুতরাং যে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের (আ.) মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, এমামরা সকলেই একমত যে আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত এবাদত নিষ্ফল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন কেউ আপনাকে একটি মোটর গাড়ি উপহার দিলেন। মনে করুন এই মোটর গাড়িটি ইসলাম- আল্লাহ মানবজাতিকে যা উপহার দিয়েছেন। যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করে করতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance ইড়ড়শ। মনে করুন এই বই কোর'আন ও সহীহ হাদিস। গাড়ির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটাতে চড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এটাই হচ্ছে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরিই করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরামে বসার জন্য তার ভিতরে গদীর আসন তৈরি করা হয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও ক্যাসেট পেণ্ঢয়ার লাগানো হয়েছে, গাড়িটিকে সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে। কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হয়ে গেলে কেমন রং কেমনভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও মূল সত্য হচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য যে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে। বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কী হয়, ওটাকে কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কী করবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করার জন্য। কিম্বা ভাববেন এটা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে রেডিও শোনার জন্য, ক্যাসেটে সঙ্গীত শোনার জন্য। আর তাই মনে করে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ক্যাসেট বাজাবেন।

এই হলে আপনার আকিদার ভুল হলো। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হলো কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য কী। অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হলো আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে

গাড়ির রেডিও, ক্যাসেট, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে মহা প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত আলেম, ফকিহ, এমামরা একমত হয়েই বলেছেন যে আকিদা অর্থাৎ কোনো ব্যাপার বা জিনিস সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা না হলে বা ওটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা হলে সম্পূর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং অন্যান্য এবাদতও অর্থহীন।

আল্লাহ আমাদের ইসলাম বলে যে দীন, জীবন-বিধান দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য কী, সেই আকিদা আমাদের বহু পূর্বেই বিকৃতি হয়ে ঐ গাড়ির মালিকের মত হয়ে গেছে- যে গাড়ির উদ্দেশ্যই জানে না। ঐ মালিকের মত আমরা Maintenance বই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদিস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্যা করছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যেটা মনে করি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ করেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, আলখাল্লা সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। আকিদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হয়েছে যে আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লা'নতের পাত্রে পরিণত হয়েছি। আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের গণহত্যা করছে, আমাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পরদানশীন মা-বোনদের উলঙ্গ করে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এভাবেও বলা যায় যে, আকিদা হলো একটি জাহাজের রাডার বা হালের মতো। জাহাজটির পাল যতই চমৎকার হোক, তার ইঞ্জিন যতই শক্তিশালী হোক, মাস্তুলটা যতই মজবুত হোক, জাহাজটির হাল যদি ভাঙ্গা হয় তাহলে সে জাহাজ পথ হারাবেই। এটা সমুদ্রে ভেসে থাকবে আর যেদিকে বাতাসের দাপট থাকবে সেদিকেই ঘুরে যাবে। কোনোদিনই তা কোনো বন্দরে পৌঁছতে পারবে না। বর্তমানে ইসলামের জাহাজটিও সেভাবে অকূল সমুদ্রে ভাসছে, যখন যেদিক থেকে বাতাসের ধাক্কা আসছে সেদিকেই তার মাথাটি ঘুরে যাচ্ছে। জাহাজটির হাল ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে অথবা একেবারেই হারিয়ে গেছে।

বর্তমানে আকিদা ও ঈমানকে একই জিনিস বলে মনে করা হয়। এই ধারণা ভুল। প্রথমত, ঈমান শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস আর আকিদা শব্দটি এসেছে আক্‌দ শব্দ থেকে যার মানে গ্রন্থি, গিঁট বা গেরো। আমরা এই শব্দটি বিয়েতে ব্যবহার করি। আক্‌দ করানো অর্থ বিয়ে করানো, দু'টি মানুষকে গিঁট বা গেরো দিয়ে দেওয়া। ঐ আক্‌দ থেকে আকিদা। অর্থাৎ ঈমান ও আকিদা দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ এবং সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ। দ্বিতীয়ত, আকিদা ভুল হলে ঈমান অর্থহীন- এ কথাতেই তো পরিষ্কার

হয় যে ঐ দু'টো এক জিনিস নয়। একটা ভুল হলে অন্যটি অর্থহীন অর্থাৎ এক নম্বর ভুল হলে দুই নম্বর অর্থহীন- কাজেই এ দু'টো বিষয় একই বিষয় হওয়া অসম্ভব। অথচ এই ভুল ধারণা আজ সর্বব্যাপী। এটা হয়েছে এই জন্য যে ইসলামের প্রকৃত আকিদা আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, তাই ওটাকে ঈমানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে- যদিও এ দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

এই দীনের সঠিক আকিদা এ রকম:

১। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর এই বিরাট বিশাল মখলুক সৃষ্টি করলেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের ও পরিচালনার জন্য অসংখ্য মালায়েক বা ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন। এই সৃষ্টির (মখলুকের) বা ঐ মালায়েকদের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ছিল না এবং নেই। যাকে যে কাজের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করলেন বা যে কাজের দায়িত্ব দিলেন তারা নিখুঁতভাবে সেই কাজ করে চলল, যার সামান্যতম বিচ্যুতি নেই।

২। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এমন এক সৃষ্টি করতে যে সৃষ্টির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকবে, যে ইচ্ছা করলে আল্লাহর দেয়া নিয়ম ও দায়িত্ব মোতাবেক চলবে, ইচ্ছা করলে তা অমান্য করতে পারবে।

৩। তাই আল্লাহ আদম অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করলেন। আদমের মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা (রূহ্) থেকে ফুঁকে দিলেন (সুরা হেজর ২৯) অর্থাৎ আদমের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই, তা এবং আল্লাহর অন্যান্য সকল সিফত্ বা গুণ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কাজেই এই নতুন অসাধারণ সৃষ্টির নাম দিলেন আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি (সুরা বাকারা ৩০)।

৪। একটা বিরুদ্ধশক্তি না থাকলে কোনো পরীক্ষা (Test) সম্ভব নয় তাই ইবলিস বা শয়তানকে এই খলিফার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন এবং ঐ পরীক্ষার জন্য ইবলিসকে মানুষের দেহ মনের মধ্যে প্রবেশ ও তাকে প্রভাবিত করার অনুমতি ও শক্তি দিলেন।

৫। ইবলিস আল্লাহকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান (Challenge) করল এই বলে যে তোমার এই খলিফাকে আমি ফাসাদ অর্থাৎ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এবং সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাতের মধ্যে পতিত করবো। আল্লাহ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে গ্রহণ করে বললেন- আমি আমার প্রেরিত নবী-রসুলদের এবং হাদিদের মাধ্যমে আমার খলিফা মানুষদের জন্য এমন জীবন-ব্যবস্থা, দীন পাঠাব যে জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত করলে তারা ঐ ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে না, অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও শান্তিতে (ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি) পৃথিবীতে বাস করতে পারবে। এখানে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইবলিস আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দিল না যে তোমার খলিফা, প্রতিনিধিকে আমি মসজিদে, গির্জায়, মন্দিরে, সিনাগগে, প্যাগোডায় যেতে বাধা দেব, তাদের হজ্ব করতে, রোযা রাখতে, যাকাত দিতে, দান-খয়রাত করতে বা অন্য যে কোনো পুণ্য কাজে, সওয়াবের কাজে বাধা দেব। সে এই চ্যালেঞ্জ দিল যে মানুষকে সে ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত করবে। অন্যায়, অবিচার, অশান্তি

এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত, এ দু'টোই সমষ্টিগত ব্যাপার এবং ঠিক এ দু'টোই মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতির সর্বপ্রধান সমস্যা হয়ে আছে যার সমাধান আজ পর্যন্ত করা যায় নি।

৬। মানুষ জাতিকে তাঁর দেয়া জীবন-বিধান পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে বললেন- ইবলিস, শয়তান আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে সে তোমাদের দিয়ে আমাকে অস্বীকার করাবে, অর্থাৎ আমার পাঠানো জীবন-ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে তোমাদের নিজেদের দিয়ে জীবন-ব্যবস্থা তৈরি করিয়ে সেই মত তোমাদের সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত করাবে, যার ফলে তোমরা সেই ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে। তোমরা ইবলিসের প্ররোচনায় না পড়ে আমাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বলে গ্রহণ করো অর্থাৎ নবী-রসুলদের মাধ্যমে আমি যে জীবন-বিধান পাঠিয়েছি তা গ্রহণ ও সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগ করো, তাহলে তোমাদের জীবন থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত অন্যায়-অবিচার চলে যাবে এবং তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত হবে না অর্থাৎ তোমরা পূর্ণ শান্তিতে (ইসলামে) বাস করতে পারবে। আমি সর্বশক্তিমান-আমি ইচ্ছা করলেই সমস্ত মানবজাতি ইবলিসকে অস্বীকার করে আমার পাঠানো দীনকে গ্রহণ করে শান্তিতে বাস করবে (সুরা আনআম- ৩৫, সুরা ইউনুস- ১০০)। কিন্তু আমি তা করব না কারণ আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আমি তোমাদের দিয়েছি পরীক্ষা করার জন্য যে তোমরা কী করো (সুরা মোহাম্মদ- ৪)। তোমরা শয়তানের প্ররোচনায় পতিত না হয়ে আমাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বলে গ্রহণ করলে তার ফলস্বরূপ এ পৃথিবীতে যেমন শান্তিতে (ইসলামে) বাস করবে, তেমনি পরজীবনেও আমি তোমাদের জান্নাতে স্থান দেবো। তোমাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ আমি মাফ করে দেব কারণ তাহলে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে জয়ী করালে। আর যদি শয়তানের প্ররোচনায় আমার দেওয়া জীবন-বিধানকে অস্বীকার করে নিজেরা জীবন-ব্যবস্থা তৈরি করে নাও তবে তার ফলস্বরূপ তোমরা সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার আর রক্তপাতে ডুবে তো থাকবেই তার ওপর মৃত্যুর পর পরজীবনে আমি তোমাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত করবো। তোমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ কোটি সওয়াব পুণ্যের দিকে আমি চেয়েও দেখব না। কারণ তাহলে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে পরাজিত করে দিলে। এটা আমার প্রতিশ্রুতি।

৭। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানবজাতির সম্মুখে মাত্র দু'টি পথ। একটি হচ্ছে নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করা, অন্যটি হচ্ছে ঐ জীবন-বিধান প্রত্যাখ্যান করে নিজেরা জীবন-ব্যবস্থা তৈরি করে তাই মেনে চলা। মানবজাতিকে এই দুই পথের একটাকে গ্রহণ করতে হবে, তৃতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহ বললেন, যে বা যারা প্রথমটি গ্রহণ করবে এবং তা থেকে বিচ্যুত হবে না তাদের কোনো ব্যক্তিগত গোনাহ, পাপ তিনি দেখবেন না, তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। আর যে বা যারা নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবন-বিধান অস্বীকার করে নিজেরা জীবন-ব্যবস্থা তৈরি করে নেবে তাদের ব্যক্তিগত কোনো সওয়াব, পুণ্য তিনি গ্রহণ করবেন না, তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এই যে সমষ্টিগতভাবে জীবন বিধানকে গ্রহণ ও

প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে ব্যক্তিগত জীবনকে দাম না দেয়া, এর কারণ হচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান কার্যকর করলে সমাজ থেকে সবরকম অন্যায়-অবিচার, দুঃখ, যুদ্ধ ও রক্তপাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত অন্যায় প্রায় লোপ পাবে। আর মানুষের নিজের তৈরি জীবন-ব্যবস্থা চালু করলে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যত ভালো থাকার চেষ্টা করুক না কেন সমাজ সব রকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি ও রক্তপাতের মধ্যে পতিত হবে। উদাহরণ- বর্তমান সময়।

৮। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ অর্থাৎ আদেশদাতা বলে গ্রহণ করার অর্থ জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি স্তরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গনে গ্রহণ করা। এটাই হলো তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকিম, দীনুল কাইয়্যেমা। যে বা যারা এর উপর অনড় থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার এবং তাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ মাফ করে আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাত নিশ্চিত করে দিয়েছেন।

বিশ্বনবী এ কথাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন এই বলে যে, আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার চুক্তি (Contract) এই যে, বান্দা তাঁর পক্ষ থেকে যদি এই শর্ত পালন করে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ অর্থাৎ বিধাতা বলে স্বীকার করবে না- তবে আল্লাহও তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত পালন করবেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন [হাদিস- মুয়ায (রা.) থেকে বোখারি, মুসলিম, মেশকাত]। এখানে অন্য কোনো কাজের শর্ত নেই। এই একটি শর্ত পালন করলে আর কোনো গোনাহই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না; এমনকি মহানবীর উল্লিখিত ব্যভিচার ও চুরির মত কবিরা গোনাহও না। একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বান্দার সঙ্গে এই চুক্তি করছেন, তেমনি এ কথাও পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে, জীবনের যে কোনো অঙ্গনে, যে কোনো বিভাগে তাঁর আইন অস্বীকার করলে অর্থাৎ শেরক করলে তিনি তা ক্ষমা করবেন না, লক্ষ লক্ষ সওয়াবের কাজ করলেও না, সারারাত্র তাহাজ্জুদ নামায পড়লেও না, সারা বছর রোযা করলেও না (সুরা নেসা ৪৮, ১১৬)।

৯। আল্লাহ তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি স্থানে, প্রতি জনপদে তাঁর সৃষ্ট জীবন-বিধান অর্থাৎ দীন পাঠিয়ে দিলেন এবং মানবজাতি যখন উপযুক্ত হলো তখন সমস্ত পৃথিবী ও মানবজাতির জন্য জীবন-বিধানের শেষ সংস্করণ দিয়ে তাঁর শেষ রসুল মোহাম্মদ (দ.) কে পাঠালেন। এখন কথা হচ্ছে বিধান, সংবিধান, দীন শুধু পাঠালেই কি কাজ শেষ হয়ে গেল? অবশ্যই নয়, কারণ এটা যদি গৃহীত না হয়, শয়তানের প্ররোচনায় যদি ঐ দীন প্রত্যাখ্যাত হয়, যদি তা প্রয়োগ ও কার্যকর না করা হয় তবে ঐ দীন পৃথিবীতে আসা না আসা সমান কথা। তাই আল্লাহ ওটাকে প্রয়োগ ও কার্যকর করারও বন্দোবস্ত করলেন। দীনকে সমস্ত পৃথিবীময় প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করার উপায়, পদ্ধতি তিনি স্থির করলেন জেহাদ ও কেতাল- অর্থাৎ সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম (সুরা বাকারা-২১৬)। অর্থাৎ জেহাদকে তিনি নীতি হিসাবে নির্দিষ্ট করলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, অর্থাৎ সর্বব্যাপী তওহীদ ও ঐ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা মানবজীবনে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠা– এই দুই হলো এই

দীনের মূলমন্ত্র। এবং মূলমন্ত্র বলেই তওহীদে যিনি অবিচল তার মহাপাপও (গুনাহে কবীরা) হিসাবে ধরা হবে না এবং জেহাদে যিনি প্রাণ দিয়েছেন তার তো কথাই নেই, যিনি জেহাদের অভিযানে বের হয়ে অর্ধেক রাত্রি শিবির পাহারা দিয়েছেন তারও সারা জীবনের মহাপাপ ও কোনো সওয়াবের কাজ না করাকেও উপেক্ষা করে তাকে সরাসরি জান্নাতে স্থান দেয়া হবে (হাদিস- ইবনে আ'য়েয (রা.) থেকে- বায়হাকি, মেশকাত)। এই দুই মূলমন্ত্র বাদে এ দীনে আর যা আছে সব এই দুই-এর পরিপূরক। এই দুই মূলমন্ত্র যদি মূলমন্ত্র, মূলনীতি হিসাবে না থাকে তবে বাকি আর যা কিছু আছে সবই বৃথা, অর্থহীন। এই জন্যই যার মাধ্যমে এই দীন পৃথিবীতে এসেছে সেই বিশ্বনবী বলেছেন- ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন মানুষের রোযা রাখা হবে না খেয়ে থাকা, উপবাস হবে, রোযা হবে না; আর গভীর রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়া ঘুম নষ্ট করা হবে, নামায হবে না (হাদিস-মেশকাত)।

এই উম্মাহর আকিদার বিকৃতি কখন এলো? বিশ্বনবী তাঁর উম্মাহকে যে আকিদা শিক্ষা দিয়ে গেলেন সেটা হলো এই: ক) মানব জাতির মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত রকমের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার দূর করা সম্ভব মাত্র একটি উপায়ে এবং সেটি হলো আল্লাহর দেয়া সংবিধান অর্থাৎ কোর'আন মানব জাতির জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ। খ) ঐ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন (সুরা ফাতাহ ২৮) এবং যেহেতু ঐ বিরাট কাজ এক জীবনে সম্ভব নয় তাই তাঁর চলে যাবার পর সে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট উম্মাহর উপর। গ) যেহেতু সবিনয়ে নিবেদন করলেই কাফের, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও মোশরেক মানব জাতি তা গ্রহণ করবে না, অন্যায়ের মধ্যেই বাস করবে, তাই সর্বাত্মক সংগ্রাম করে তাদের রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করতে হবে যাতে তারা ঐ সংবিধানের সুফল ঘনিষ্ঠভাবে, প্রত্যক্ষভাবে দেখে সেটাকে স্ব-ইচ্ছায় গ্রহণ করে (হাদিস- আবু যর (রা.)। ঘ) ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত জাতি ও বাহিনী ছাড়া কোনো সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রাম সম্ভব নয় তাই ঐ ঐক্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষার প্রক্রিয়া হলো সালাত (নামায)। কিন্তু (সালাত) নামায উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া মাত্র। ঙ) অর্থাৎ বিশ্বনবীকে প্রেরণ, সংবিধান কোর'আন অবতরণ, উম্মতে মোহাম্মদী নামে এক দুর্ধর্ষ অপরাজেয় যোদ্ধা জাতির সৃষ্টি সবই একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং সেটা হলো মানব জাতির মধ্য থেকে সমস্ত রকমের অন্যায় (জুলুম, ফাসাদ) ও রক্তপাত (সাফাকুদ্দিমা) শেষ করে সেখানে সুবিচারও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করানো।

আগেই বলেছি, আকিদা শব্দটির মূল হলো আক্দ অর্থাৎ গেরো, গিট, গ্রন্থি। একটি পুরুষ ও একটি নারীকে আক্দ করিয়ে দেওয়া অর্থাৎ দুজনকে গেরো দিয়ে বেঁধে দেয়া, গ্রন্থিতে আবদ্ধ করা। ইসলামের আকিদার বেলাতেও ঐ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে ভাব, ধারণা ও অভিপ্রায়ে আকিদা শব্দ ঈমানের ব্যাপারে প্রয়োগ হয়েছে তা এই রকম: আল্লাহ, রসুল, মালায়েক (ফেরেশতা), কেয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদির ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস (ঈমান) মো'মেন ও মুসলিম হতে গেলে অত্যাবশ্যক, সেগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি ফুল মনে করুন। এই বিভিন্ন ফুলগুলি দিয়ে

একটি মালা গাঁথতে হবে। ঐ ফুলগুলির মধ্য দিয়ে সুতো পরিয়ে সুতোর দু'মাথায় একটি গেরো দিতে হবে। এই গেরো বা গ্রন্থিই আকিদা। এই গেরো না দিলে সব ফুল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়ে যাবে। ফুলগুলি যত সুন্দরই হোক, যত সুগন্ধীই থাকুক, আসল উদ্দেশ্য যে মালা, সেই মালা হবে না। মালা না গেঁথে শুধু ফুলগুলি কারো গলায় পরানো যাবে না। অর্থাৎ ঐ গেরো ছাড়া অতসব সুন্দর, সুগন্ধীযুক্ত ফুলগুলি অর্থহীন কারণ আসল উদ্দেশ্য হলো ঐ মালা। আলাদা আলাদা ফুলগুলি শুধু ফুল, তারপর ঐ গ্রন্থি, গিঁট দিলেই তখন আর ফুল রইল না, তখন সব ফুল মিলে নতুন আরেকটি জিনিস সৃষ্টি হলো, সেটা মালা। আল্লাহ ও রসুল মো'মেনদের কাছে ঐ মালা চান। তাই বড় বড় ফকিহরা বলেছেন- যথার্থ (মোকাম্মেল) ঈমান থাকা সত্ত্বেও আকিদার অভাবে বা বিকৃতিতে মানুষ মোশরেক ও কাফের হয়ে যেতে পারে। এবং তাই হয়েছে, পৃথিবীময় নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ছাড়াও বহু নফল এবাদত হচ্ছে, কিন্তু ঐ গিঁট, গ্রন্থির অভাবে সব ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ে আছে। মালা নেই এবং মালা নেই বলেই ঐ সব সুন্দর ফুলগুলির কোনো দাম নেই। এই কারণেই নবী করিমের (দ.) সেই বাণী- এমন সময় আসবে যখন মানুষের রোযা শুধু না খেয়ে থাকা হবে, তাহাজ্জুদ ঘুম নষ্ট করা হবে।

গ) ঐ মালা হলো উম্মতে মোহাম্মদী এবং তার চরিত্র, এবং উম্মতে মোহাম্মদীর এবং তাঁর চরিত্রের উদ্দেশ্য হলো সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (চূড়ান্ত সত্য, ন্যায়, Ultimate Truth) কায়েম করে তাঁর সংবিধান প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জকে পরাজিত করে ঐ বিজয়ের মালা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের গলায় পরিয়ে দেওয়া।

আকিদা হারিয়ে গেলে বা ভুল হলে কীভাবে কোনো ব্যক্তি বা গোটা জাতির সব আমল, সওয়াবের কাজ অর্থহীন হয়ে যেতে পারে সেটা বোঝাতে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। একটি সংখ্যা লিখুন সেটা হতে পারে ১ অথবা ২ অথবা ৫ অথবা ৯। এখন এর পরে একটি শূন্য (০) যোগ করুন। সংখ্যাটি তাহলে দশগুণ বড় হয়ে গেল। আরেকটি শূন্য যোগ করুন, এবার সংখ্যাটি একশ গুণ বড় হয়ে গেল। আরেকটি শূন্য যোগ করুন, এবার সংখ্যাটি এক হাজার গুণ বড় হয়ে গেল। এভাবে আপনি যতই শূন্য যোগ করতে থাকবেন ততই মূল সংখ্যাটির মান বিরাট হতে থাকবে। এই উদাহরণে মূল সংখ্যাটি হচ্ছে সঠিক আকিদা, অর্থাৎ ইসলামের অর্থ, এর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণা। আর শূন্যগুলো হচ্ছে নেক আমল, ভালো কাজ। সংখ্যাটির পরে এভাবে শত শত শূন্য যোগ করা যেতে পারে, ফলে সংখ্যাটির মান হাজার হাজার গুণ বেড়ে যাবে, কিন্তু যদি সংখ্যাটিই মুছে ফেলা হয়, কী থাকবে? থাকবে অনেকগুলো অর্থহীন, মূল্যহীন শূন্য (Zero)। এটা হচ্ছে আকিদা একেবারে হারিয়ে যাওয়ার পরিণাম। পক্ষান্তরে যদি আকিদা বিকৃত হয় অর্থাৎ সংখ্যাটির পরিবর্তে যদি একটি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভূজ বা কোনো পাহাড় পর্বতের ছবি যোগ করা হয় তাহলেও ঐ শূন্যগুলো কোনো সংখ্যা বা অর্থ সৃষ্টি করতে পারবে না। এটাই হচ্ছে আকিদা ও আমলের সম্পর্ক।

এই আকিদার বিকৃতির ফলে শুধু যে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে গেছে তাই নয়, এর ছোটখাটো উদ্দেশ্যও বিকৃত হয়ে গেছে। একটি অতি সাধারণ ব্যাপার নিন। আল্লাহ ও তাঁর রসুল মেয়েদের পরদা (হিজাব) করতে আদেশ দিয়েছেন। কেন? উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে আঁটশাট কাপড় পরে, অর্ধনগ্ন হয়ে যুবতী, তরুণী মেয়েরা ঘুরে বেড়ালে তাদের দিকে চোখ পড়লে মানুষের আদীম প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত আত্মসংবরণ করতে পারবে না, অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে, পরিণতিতে হয়ত অন্যের সঙ্গে সংঘাত হবে, হয়ত পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হবে, মোট কথা নানাভাবে সমাজে অশান্তি, গোলযোগ সৃষ্টি হবে, আত্মারও অবনতি হবে। তাই ঐ পরদার, হেজাবের আদেশ। ঐটাই উদ্দেশ্য বলে যেসব মেয়েদের বয়স বেশি হয়েছে, যারা প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা হয়েছেন অর্থাৎ যাদের দেখলে কোনো প্রবৃত্তি উত্তেজিত হবে না তাদের ঐ পরদা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। আজকাল পথেঘাটে দেখবেন প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা মা, দাদীরা কিম্ভূত কিমাকার বোরকায় আপদমস্তক ঢেকে আছেন আর তাদের সঙ্গে আধুনিক, মেকআপ করা অর্ধনগ্না মেয়ে, নাতনিরা বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে পরদা করার আদেশ হয়েছে তার ঠিক উল্টোটা করা হচ্ছে। বৃদ্ধার পরদার দরকার ছিল না, যার দরকার ছিল তাকে পরদা করানো হয় নি। এটাই পরদার আকিদা না বোঝার, বা আকিদা বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফল। ইসলামের প্রতিটি ব্যাপারে আজ ঐ অবস্থা। আল্লাহ রসুল যে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন আজ ঠিক তার উল্টো উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, মূল ব্যাপারে উদ্দেশ্যই নেই।

মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী

বর্তমান সময়ে চালু ইসলামে 'মো'মেন', 'মুসলিম' ও 'উম্মতে মোহাম্মদী'এই তিনটিকে একার্থবোধক অর্থাৎ তিনটিই একই জিনিস হিসাবে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তিনটিই আলাদা, যদিও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আকিদা সঠিক করার জন্য এই তফাৎ বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রথমত, মো'মেন শব্দটা এসেছে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস থেকে। যে বা যারা আল্লাহ্, রসুল, কোর'আন, মালায়েক (ফেরেশতা) শেষ বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম, এক কথায় আল্লাহ কোর'আনে যা বলেছেন এবং রসুল হাদিসে যা বলেছেন তা সব নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, সেসব লোক মো'মেন। কিন্তু মো'মেন হওয়া মানেই মুসলিম হওয়া নয়। কারণ কোনো লোক সব কিছু বিশ্বাস করেও, সত্য জেনেও আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে জাতীয়, সামাজিক জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা নাও করতে পারেন। বিশ্বাস করেও প্রয়োগ না করার কারণ অনেক কিছু হতে পারে। যেমন-বিকৃত আকিদা, হীনম্মন্যতা, পাশ্চাত্য জগৎ সেকেলে ভাববে- আধুনিক জগতে এটার আইন অচল ইত্যাদি ধারণা (আকিদা)। এই সব লোক ব্যক্তিগতভাবে মো'মেন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম নন, উম্মতে মোহাম্মদীও

নন। আল্লাহ ধরে নিচ্ছেন যে- যে আমাকে ও আমার কথা বিশ্বাসই করল সে স্বভাবতঃই পৃথিবীর অন্য সমস্ত কিছু অস্বীকার করে আমার দেওয়া দীন তার পূর্ণ জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করবে। কাজেই তিনি কোর'আনে বহু জায়গায় মো'মেনদের ক্ষমা, দয়া ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু হীনম্মন্যতায় বা আকিদা বিকৃতির জন্য যারা 'দীন' জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে না তাদের তিনি ঈমান থাকা সত্ত্বেও মো'মেন বলে স্বীকার করবেন না। তারা মুসলিমও নয়, উম্মতে মোহম্মদী তো নয়ই। উদাহরণ বর্তমানে 'মুসলিম' বলে পরিচিত জনসংখ্যাটি।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম শব্দ এসেছে সালাম থেকে। যিনি বা যারা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা, দীনকে সামগ্রিকভাবে তসলিম অর্থাৎ সসম্মানে গ্রহণ করে তা জাতীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্যসব রকম ব্যবস্থাকে বর্জন করেছেন তিনি বা তারা মুসলিম। এখানেও একজন মুসলিম হয়েও মো'মেন নাও হতে পারেন। যেমন- কোথাও দেশসুদ্ধ সকলে মুসলিম হয়ে গেল। সেখানে একজন বা কিছুসংখ্যক মোশরেক বা নাস্তিক নানা রকম সামাজিক অসুবিধার কথা চিন্তা করে মুসলিম হয়ে গেল, অর্থাৎ আল্লাহ, রসুল ও ইসলামকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস না করেও সমাজের অন্য সবার সাথে আল্লাহর আইন ও দীন স্বীকার ও তসলিম করে নিল। এ লোক মুসলিম, কিন্তু মো'মেন নয়। এর উদাহরণ দেওয়া যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই। নবী করীমের ওফাতের আগেই সম্পূর্ণ আরব মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এটা ইতিহাস। কিন্তু আল্লাহ নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন-"আরবরা বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি (ঈমান এনেছি)। বল, তোমরা বিশ্বাস করনি। বরং বল, আমরা শুধু আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ বিশ্বাস (ঈমান) তোমাদের আত্মায় প্রবেশ করে নি।"

এর ঠিক পরের আয়াতেই আল্লাহ প্রকৃত মো'মেন কে, তা আমাদের বলে দিচ্ছেন। আল্লাহ বলেছেন- "শুধু তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে, তারপর আর (সে সম্বন্ধে) কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং তাদের সম্পদ (টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি) ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। (শুধু) এরাই হলো অকপট সত্য (সুরা আল হুজরাত-১৪, ১৫)। অর্থাৎ মো'মেন হতে হলে এবং আকিদা যদি বিকৃত না হয় তবে অবশ্য অবশ্যই জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে হবে। আল্লাহর কথা যে সত্য তা প্রমাণ হয়ে গেল রসুলাল্লাহ এর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই। চারদিকে বহু লোক ইসলামকে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ ইসলামকে গ্রহণ করার ফলে তারা বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামকে স্বীকার করে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সত্যিকার বিশ্বাস তারা করে নি, তারা মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু মো'মেন হয় নি।

অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া সংজ্ঞার আলোকে যারা সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিপক্ষে অবস্থান নেবে এবং নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করে মানবতার কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করবে তারাই মো'মেন। পক্ষান্তরে যারা শুধু নিজের স্বার্থে জীবন অতিবাহিত করে, সামষ্টিক শান্তির চিন্তা না করে কেবল নিজ সুখ-সমৃদ্ধির কথা ভাবে তারা তো পশুর জীবন যাপন করছে। পশুও খায়, সন্তান জন্ম দেয়, এক পর্যায়ে মারা যায়।

স্বার্থপর মানুষও ঠিক ঐ রকম, তাদের আগমনে মানবজাতি কোনো উপকার পায় নি, তাই এদের মানবজনম ব্যর্থ।

মো'মেন ও মুসলিম যে এক নয় তা হাদিস থেকেও দেখাচ্ছি। সা'দ (রা.) বলছেন- একবার আমি রসুলাল্লাহর কাছে বসা ছিলাম- যখন তিনি একদল লোককে দান করছিলেন। সেখানে এমন একজন লোক বসা ছিলেন যাকে আমি একজন উত্তম মো'মেন বলে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তিনি (নবী করিম দ.) তাঁকে কিছুই দিলেন না। এ দেখে আমি বললাম, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি ওনাকে কিছু দিলেন না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি একজন মো'মেন।' রসুলাল্লাহ বললেন, 'মো'মেন বলো না, মুসলিম বলো।' আমি কিছু সময় চুপ থেকে আবার ঐ কথা বললাম এবং তিনিও আবার ঐ জবাবই দিলেন- মো'মেন বলো না, মুসলিম বলো। তৃতীয়বার আমি ঐ কথা বললে রসুলাল্লাহর বললেন, সা'দ! আমি অপছন্দনীয় লোকদেরও দান করি এই কারণে যে আমার আশঙ্কা হয় তারা অভাবের চাপে জাহান্নামের পথে চলে যেতে পারে।" (হাদিস- বোখারি) এখানে মহানবীর কথা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে মো'মেন ও মুসলিম এক নয়।

এই হাদিসের আরেকটি চিত্তাকর্ষক দিক আছে। সা'দ (রা.) যার জন্য সুপারিশ করছিলেন তিনি আর কেউ নন, তিনি যোয়াইল (রা.) যার সম্বন্ধে মহানবী স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে প্রশংসা করেছেন। অর্থাৎ সা'দ ঠিকই বলেছিলেন যে তিনি উত্তম মো'মেন। আসল কথা, বিশ্বনবী সেদিন দান করছিলেন মুসলিমদের- মো'মেনদের নয়, তাই তিনি সেদিনের দানে যোয়াইল (রা.) কে অন্তর্ভুক্ত করেন নি এবং সা'দ (রা.) যখন তাকেও দান করতে অনুরোধ করলেন তখন তিনি সা'দ (রা.) কে বললেন মো'মেন বলো না, মুসলিম বলো। অর্থাৎ আজকের দান নিতে হলে যোয়াইল (রা.) কে মুসলিম হিসাবে নিতে হবে। এ ছাড়াও আল্লাহ বহু জায়গায় মো'মেনদের এবং মুসলিমদের আলাদা আলাদাভাবে সম্বোধন করেছেন।

তৃতীয়ত, উম্মতে মোহাম্মদী। এ সম্বন্ধে পেছনে বলে এসেছি। আল্লাহ আদম (আ.) থেকে শুরু করে তাঁর প্রত্যেক নবী-রসুল (আ.) কে পাঠিয়েছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য দিয়ে তাহলো যার যার জাতির মধ্যে আল্লাহর তওহীদ ও তাঁর দেওয়া জীবনব্যবস্থা দীন প্রতিষ্ঠা করা। শেষ নবীকে পাঠালেন সমস্ত মানব জাতির উপর এই দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য (সুরা ফাতাহ-২৮, সুরা তওবা-৩৩, সুরা সফ্-৯)। পূর্ববর্তী নবীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা অনেকেই তাদের জীবনেই পূর্ণ করে যেতে পেরেছিলেন, কারণ তাদের দায়িত্বের পরিসীমা ছিল ছোট। কিন্তু এই শেষ জনের দায়িত্ব হলো এত বিরাট যে এক জীবনে তা পূর্ণ করে যাওয়া অসম্ভব। অথচ যতদিন ঐ দায়িত্ব পূর্ণ করা না হবে ততদিন তাঁর উপর আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব অপূর্ণ-অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই তিনি এমন একটি জাতি সৃষ্টি করলেন পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়ার পরও যে জাতি তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য তাঁরই মত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই জাতি হলো তাঁর উম্মাহ-উম্মতে মোহাম্মদী- মোহাম্মদের জাতি। বিশ্বনবী তাঁর উম্মাহকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর চলে যাবার পর তিনি যেমন

করে সংগ্রাম করে সমস্ত আরবে দীন প্রতিষ্ঠা করলেন, ঠিক তেমনি করে বাকি দুনিয়ায় ঐ দীন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হবে। ঐটাকে তিনি বললেন 'আমার সুন্নাহ'; অর্থাৎ আমি সারা জীবন যা করে গেলাম এবং এও বললেন যে, যে আমার এই সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে বা তারা আমার কেউ নয়; অর্থাৎ আমার উম্মত নয়। অবশ্যই, কারণ আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠালেন, যে দায়িত্ব তিনি এক জীবনে পূর্ণ করতে না পারায় এক উম্মাহ সৃষ্টি করে তার উপর অর্পণ করে চলে গেলেন, সেই দায়িত্ব যে বা যারা ছেড়ে দেবে-ত্যাগ করবে, তারা নিশ্চয়ই তার কেউ নয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম যিনি বিশ্বনবীকে প্রেরিত বলে স্বীকার করে এই দীনে প্রবেশ করলেন; অর্থাৎ আবু বকর (রা.) মুসলিম হয়েই রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এখন আমার কাজ কি? কর্তব্য কি?" আল্লাহর শেষ নবী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আমরা ইতিহাসে ও হাদিসে পাই। তিনি বললেন, "এখন থেকে আমার যে কাজ তোমারও সেই কাজ।" কোনো সন্দেহ নেই যে যদি প্রত্যেকটি মানুষ-যারা ঈমান এনে মহানবীর হাতে মুসলিম হয়েছিলেন তারা আবু বকরের (রা.) মত- যদি ঐ প্রশ্ন করতেন তবে তিনি প্রত্যেককেই ঐ জবাব দিতেন। "আমার যে কাজ" বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? তাঁর কী কাজ ছিল? তাঁর কাজ তো মাত্র একটা, যে কাজ আল্লাহ তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। সেটা হলো সমস্ত রকমের জীবনব্যবস্থা 'দীন' পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এই শেষ দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাসে পাচ্ছি, শেষ-ইসলামকে গ্রহণ করার দিনটি থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আবু বকরের (রা.) কাজ একটাই হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল মহানবীর সংগ্রামে তাঁর সাথে থেকে তাঁকে সাহায্য করা। শুধু আবু বকর (রা.) নয়, যে বা যারা নবীকে বিশ্বাস করে মুসলিম হয়েছেন সেই মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বা তারা বিশ্বনবীকে তাঁর ঐ সংগ্রামে সাহায্য করে গেছেন, তাঁর সুন্নাহ পালন করে গেছেন। আর কেমন সে সাহায্য! স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ত্যাগ করে, বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে, অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে, নির্মম অত্যাচার সহ্য করে, অভিযানে বের হয়ে গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই হলো তাঁর উম্মাহ, উম্মতে মোহাম্মদী, তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী জাতি।

উম্মতে মোহাম্মদীর যে অর্থ বললাম, আবু বকর (রা.) সহ সমস্ত সাহাবারা যে সেই অর্থেই বুঝেছিলেন; বিশ্বনবী যে সেই অর্থেই তাদের বুঝিয়েছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে রসুলাল্লাহর পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর ৬০/৭০ বৎসর পর্যন্ত তাঁর উম্মাহর কার্যাবলী। এ ইতিহাস অস্বীকার করার কারো উপায় নেই যে নবী করিমের পর তাঁর ঐ উম্মাহ বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ আরবের বাইরে তাঁর ঐ সংগ্রাম ছড়িয়ে দিলো এবং পৃথিবীর একটা বিরাট অংশে এই দীন প্রতিষ্ঠা করল। আমি উম্মতে মোহাম্মদীর যে অর্থ-সংজ্ঞা করছি তা যদি ভুল হয়ে থাকে তবে ঐ উম্মাহর ঐ কাজের আর মাত্র দু'টি অর্থ হতে পারে। সে দু'টি হচ্ছে- ক) অস্ত্রের জোরে পৃথিবীর মানুষকে ধর্মান্তরিত করা। এটা হয়ে থাকলে আল্লার বাণী- "বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা নিষিদ্ধ" (সুরা বাকারা-২৫৬) এর অর্থ আল্লাহর নবীও বোঝেন নি, তাঁর সাহাবীরাও বোঝেন নি বা অস্বীকার করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। আর তা হলে অন্তত ঐ সময়ের জন্য

আটলান্টিকের তীর থেকে চীনের সীমান্ত আর উরাল পর্বত থেকে ভারত মহাসাগর এই ভূখণ্ডে একটাও অমুসলিম থাকতো না। কিন্তু ইতিহাস তা নয়। খ) পর-রাজ্য, পর-সম্পদ লোভে আলেকজান্ডার, তৈমুর, হালাকু ইত্যাদির মত সাম্রাজ্য বিস্তার। যদি তা হয়ে থাকে তবে মোহাম্মদ (দ.) অবশ্যই আল্লাহর রসুল ছিলেন না (নাউযুবিল্লাহ)। তৃতীয় এমন কোনো কারণ হতে পারে না যেজন্য একটি দেশের প্রতিটি যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি তার পার্থিব সব কিছু কোরবান করে বছরের পর বছর একটানা যুদ্ধ করে যেতে পারে। রসুলাল্লাহ বলেছেন, "যে বা যারা আমার সুন্নাহ ত্যাগ করবে তারা আমাদের কেউ নয়।" যে বা যারা রসুলাল্লাহর কেউ নয় সে বা তারা কি তাঁর উম্মাহ, 'উম্মতে মোহাম্মদী'? সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়- অবশ্যই নয়। অর্থাৎ তাঁর সুন্নাহ ও তাঁর উম্মাহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা ছাড়া আরেকটা নেই। আল্লাহ তাঁর নবীর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন; শুধু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তাই নয়, যে কাজটা করতে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যে কাজ তিনি দায়িত্ব পাবার মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করে গেলেন- অর্থাৎ সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই জীবনব্যবস্থা, এই শেষ দীন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা- এটাই হলো তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ। এই সুন্নাহ ত্যাগকারীদের সম্বন্ধেই তিনি বলেছিলেন 'তারা আমার নয়'। তাঁর ব্যক্তি জীবনের ছোটখাটো, কম প্রয়োজনীয় অভ্যাসের সুন্নাহ বোঝান নি। একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন-"এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মাহ প্রতিটি ব্যাপারে বনি ইসরাইলকে নকল করবে। এমনকি তারা যদি তাদের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তবে আমার উম্মাহ থেকেও তাই করা হবে। বনি ইসরাইলরা বাহাত্তর ফেরকায় (ভাগে) বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মাহ তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। এর একটি ভাগ ছাড়া বাকি সবই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" সাহাবারা প্রশ্ন করলেন-"ইয়া রসুলাল্লাহ! সেই এক ফেরকা কোনটি?" তিনি জবাব দিলেন-"যার উপর আমি ও আমার সঙ্গীরা (আসহাব) আছি" (আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে- তিরমিযি, মেশকাত)। এই হাদিসটির কয়েকটি অংশ আছে। আমরা একটা একটা করে বুঝে নিতে চেষ্টা করব। প্রথম কথা হলো- প্রথমেই যে তিনি 'আমার উম্মাহ' বলে শুরু করলেন তাতে তিনি তাঁর প্রকৃত উম্মাহ বোঝান নি। পেছনে যেমন বলে এসেছি অন্য জাতিগুলি থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য অর্থাৎ ওহ মবহধৎধষ ংবহংব। দ্বিতীয়ত বনি ইসরাইল বলতে তিনি বর্তমানে ইহুদি-খ্রিষ্টান (Judio-Christian Civilisation) সভ্যতা বুঝিয়েছেন। 'পাশ্চাত্য সভ্যতা' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে খ্রিষ্টান ইউরোপ ও আমেরিকার কথাই মনে আসে। কিন্তু আসলে এরা গোড়া ইহুদি। ঈসা (আ.) খাঁটি ইহুদি বংশে জন্মেছিলেন, নিজে ইহুদি ছিলেন, তাঁর প্রত্যেকটি শিষ্য ইহুদি ছিলেন, ইহুদিদের বাইরে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা তাঁরই নিষেধ ছিল। অর্থাৎ মুসার (আ.) দীনকে তাঁর ধর্মের আলেম-যাজকরা বিকৃত, ভারসাম্যহীন করে ফেলায় সেটাকে আবার ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর কাজ, নতুন কোনো ধর্ম সৃষ্টি করা নয়। কিন্তু সেটাকে কেমন করে একটা নতুন ধর্মের রূপ দেওয়া হয়েছিল তা পেছনে বলে এসেছি। কাজেই বিশ্বনবী এখানে আলাদা করে খ্রিষ্টান না বলে একেবারে গোড়ায় ধরে শুধু ইহুদি বলছেন, কিন্তু বোঝাচ্ছেন আজকের এই জুডিও খ্রিষ্টান সভ্যতা।

তিনি বলছেন আমার উম্মাহ ঐ ইহুদি-খ্রিষ্টান অর্থাৎ বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নকল-অনুকরণ করতে করতে হীনম্মন্যতার এক বীভৎস পর্যায় পর্যন্ত যাবে। আজ নিজের জাতিটির দিকে চেয়ে দেখুন- যেটাকে সবাই বিনা দ্বিধায় উম্মতে মোহাম্মদী বলে বিশ্বাস করে- এ জাতির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শিক্ষা, আইন-দণ্ডবিধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিস ঐ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নকল-অনুকরণ। এ সমস্ত ব্যাপার থেকে আল্লাহর দীন ও তাঁর আদেশ সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। যে উম্মাহটাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ঐগুলি নিষ্ক্রিয়-অকেজো করে দিয়ে বিশ্বনবীর মাধ্যমে দেওয়া দীনকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সেই উম্মাহই যদি নিজেরটা ত্যাগ করে ঐগুলিই গ্রহণ ও নিজেদের উপর প্রতিষ্ঠা করে তবে সেই উম্মাহকে 'উম্মতে মোহাম্মদী' বলার চেয়ে হাস্যকর ও অসত্য আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয় কথা হলো রসুলাল্লাহ বলেছেন- বনি ইসরাইল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমার উম্মাহ তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে এবং মাত্র একটি ফেরকা (যেটা জান্নাতি) বাদে সবগুলি ফেরকাই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। অতি স্বাভাবিক কথা। কারণ যে ঐক্য ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কাজই করা সম্ভব নয়, কাজেই যে ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ সরাসরি হুকুম করলেন-"আমার দেওয়া দীন সকলে একত্রে ধরে রাখো এবং নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সুরা ইমরান-১০৩), যে ঐক্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহানবী বললেন, "কোর'আনের কোনো আয়াতের অর্থ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কুফর" (আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে- মুসলিম, মেশকাত) যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার জন্য বললেন-"কান কাটা নিগ্রো ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা হয় তাহলেও ঐক্যবদ্ধভাবে তার আদেশ নির্দেশ পালন কর" (ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রা.) থেকে আহমদ, আবু দাউদ তিরমিযি এবং ইবনে মাজাহ, মেশকাত)। এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুল কতভাবে চেষ্টা করেছেন তা কোর'আন এবং হাদিস থেকে দেখাতে গেলে আলাদা বই হয়ে যাবে। সেই ঐক্যকে যারা ভেঙ্গে তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে- তারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না তো কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে? জান্নাতে?

তৃতীয় কথা হলো যে একটি মাত্র ফেরকা (ভাগ) জান্নাতি হবে- যেটার কথা রসুলাল্লাহ বলেছেন- সেটা সেই কাজ নিয়ে থাকবে যে কাজের উপর তিনি ও তাঁর আসহাব ছিলেন। তিনি ও তাঁর আসহাবগণ কীসের উপর- কোন কাজের উপর ছিলেন? সেই মহাজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁর সাহাবাদের ইতিহাস যারা পড়েছেন-তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোনো পথ নেই যে, নবুয়ত পাওয়ার সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অতুলনীয় মানুষটির একটিমাত্র কাজ ছিল। সেটা হলো এই শেষ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জীবনে ন্যায়-শান্তি আনা এবং তাঁর জীবিত অবস্থায় ও তাঁর ওফাতের পরে তাঁর সঙ্গীদেরও (আসহাব) জীবন ঐ একই কাজে ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ নেতা ও তাঁর জাতির সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। যে কল্যাণের একটিমাত্র পথ-মানবের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, এক কথায় আল্লাহকে দেওয়া ইবলিসের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আল্লাহকে জয়ী করে সমস্ত মানব জাতিকে অন্যায়-অবিচার-অশান্তি-যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে উদ্ধার করে পরিপূর্ণ শান্তি, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। যে বা যারা এই সংগ্রাম করবে শুধু

তারাই রসুলাল্লাহর সুন্নাহ পালনকারী, অর্থাৎ যার উপর আল্লাহর রসুল ও তাঁর আসহাব (রা.) ছিলেন। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিশ্বনবীর ঐ সঙ্গীরা (আসহাব) তাঁর ওফাতের পর তাদের নেতার উপর আল্লাহর অর্পিত কাজ একাগ্রচিত্তে চালিয়ে গেলেন, পার্থিব সমস্ত কিছু উৎসর্গ করে চালিয়ে গেলেন। কারণ তাদের কাছে ঐ কাজ ছিল বিশ্বনবীর সুন্নাহ। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আরও দেখা যায় যে, বিশ্বনবীর সংসর্গ যারা লাভ করেছিলেন; সরাসরি তাঁর কাছ থেকে এই দীন শিক্ষা করেছিলেন; এই দীনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা করেছিলেন তারা তাঁর ওফাতের পর ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ঐ ৬০/৭০ বছর পর বিশ্বনবীর সাক্ষাৎ-সঙ্গীরা (রা.) শেষ হয়ে যাবার পরই পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সংগ্রাম যেই মুহূর্তে বন্ধ হলো জাতি হিসাবে ত্যাগ করা হলো সেই মুহূর্ত থেকে জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী শেষ হয়ে গেল। সেই জন্য মহানবী তাঁর সুন্নাহ বলতে শুধু তাঁর নিজের সুন্নাহ বললেন না। বললেন- "আমি ও আমার সঙ্গীরা যার উপর আছি" এবং অন্য সময় এও বললেন যে "আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর।"

এই সংগ্রাম-জেহাদ ত্যাগ করে অর্থাৎ আল্লাহর রসুলের প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ করে এই জাতি যখন শান-শওকতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য রাজতন্ত্রের মত রাজত্ব করতে শুরু করল তখন এক সমস্যা দেখা দিলো। সেটা হলো এই জাতি তার নেতার সুন্নাহ পালন করবে কেমন করে? প্রকৃত সুন্নাত ত্যাগ করা হয়েছে অথচ সুন্নাহ ছাড়া চলবেও না। কারণ আল্লাহর রসুল বলেছেন, "তার সুন্নাহ ত্যাগ করার অর্থই উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কার হওয়া।" এই সমস্যা থেকে জাতিকে উদ্ধার করলেন সেই অতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিত শ্রেণি, ফকীহ- মুফাসসির ইত্যাদি। সেটা হলো আসল সুন্নাহ যখন বর্জনই করা হয়েছে তখন নকলটাই করা যাক। তখন সুন্নাহ হিসাবে নেয়া আরম্ভ হলো বিশ্বনবীর ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি যেগুলির সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর খাওয়া-শোয়া-ওঠা-বসা ইত্যাদি নেহায়েত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তাঁর সুন্নাহ বলতে তিনি কখনই এগুলি বোঝান নি, বোঝালেও ওগুলো পালন না করার জন্য তার উম্মাহ থেকে বহিষ্কার অবশ্যই বোঝান নি। কারণ যে কাজের জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল অর্থাৎ 'সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যে পর্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান মানি না এবং মোহাম্মদ (দ.) আল্লাহর প্রেরিত, একথা বিশ্বাস না করে- সালাত কায়েম না করে, যাকাত না দেয় (আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বোখারি, মেশকাত) ঐ কাজের সাথে ঐ সংগ্রামের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-পছন্দ-অপছন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঐ সমাধানই গ্রহণ করা হলো এবং আজ পর্যন্ত এ হাস্যকর সমাধানই এই জাতি অতি নিষ্ঠার সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করার চেষ্টা করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ধার্মিকরা যেমন প্রত্যেকে ভাবেন 'একমাত্র আমার ধর্মই ঠিক বাকিরা সব বিপথগামী নরকে যাবে' ঠিক তেমনি ভাবে তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে বাহাত্তর ফেরকার প্রত্যেকটি মানুষ অতি নিশ্চিত যে শুধু ঐ ফেরকাই রসুলাল্লাহর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী সুতরাং সে-ই নির্দিষ্ট জান্নাতি

ফেরকা। তারাই যে নবীর সুন্নাহ পালনকারী তাতে মানুষের যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে এজন্য অনেক ফেরকা তাদের ফেরকার নামেই সুন্নাহ শব্দটা যোগ করে রেখেছেন; অর্থাৎ একমাত্র আমরাই সুন্নাহ পালনকারী জান্নাতি ফেরকা। তারা একথা বুঝতে অসমর্থ যে বিশ্বনবী তাঁর সুন্নাহ বলতে যা বুঝিয়েছিলেন তার ধারে কাছেও তারা নেই। আসল জান্নাতি ফেরকার সুন্নাহর সাথে বাকি বাহাত্তর ফেরকার সুন্নাহর আসমান-জমিন তফাৎ। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো দাঁত মেসওয়াক করা; জান্নাতি ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো রসুলাল্লাহ ও আবু ওবায়দার (রা.) মত জেহাদে সশস্ত্র সংগ্রামে দাঁত ভেঙ্গে ফেলা। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো নিজেদের ঘরে বা হুজরায় মাথার কাছে তসবিহ রেখে ডান পাশে শোয়া; জান্নাতি ফেরকার কাছে হলো মাথার কাছে অস্ত্র রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে শোয়া। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো টুপি-পাগড়ী পড়া; জান্নাতি ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো শিরস্ত্রাণ পড়া। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো লম্বা জোব্বা পড়া; জান্নাতি ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো যোদ্ধার কাপড় ও বর্ম পরা। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো খাবার পর মিঠাই খাওয়া; জান্নাতি ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো অনাহারে থেকে পেটে পাথর বেঁধে যুদ্ধ করা। আরও বহু আছে, দরকার নেই। বাহাত্তর ফেরকার সুন্নাহ পালন করতে রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবাদের মত কোরবানির প্রয়োজন হয় না, আহত হতে হয় না, নিগৃহীত-অপমানিত হতে হয় না, বিপদের সম্মুখীন হতে হয় না। কাজেই তারা অতি নিষ্ঠার সাথে ঐ অতি নিরাপদ সুন্নাহগুলি পালন করেন এবং নবীর ও আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করেন। শুধু আশা করেন না, ও সম্বন্ধে তারা অতি নিশ্চিত। যদিও তারা জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবেন না, কারণ- বিশ্বনবী বলেছেন তারা না'রী, আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। বাহাত্তর ফেরকা যে সুন্নাহগুলি পালন করেন সেগুলি শুধু বিশ্বনবীর সুন্নাহ নয় সেগুলি লক্ষ কোটি খ্রিষ্টান-ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধের সুন্নাহও'! পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই দাঁতন (মেসওয়াক) করে, কোটি কোটি অমুসলিম মাথায় টুপি দেয়, পাগড়ি পরে, দাড়ি রাখে, মোচ কামিয়ে ফেলে, খাবার পর মিঠাই খায়, ডানপাশে শোয়। এগুলি বাহাত্তর ফেরকার অতি প্রিয় সুন্নাহ। কিন্তু জান্নাতি ফেরকা যে সুন্নাহ পালন করে সে সুন্নাহ একমাত্র বিশ্বনবী ও তাঁর আসহাব ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ পালন করেন না। সেটা হলো শেষ জীবন-ব্যবস্থা, দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম। বিশ্বনবীর পবিত্র দেহে ছিল যুদ্ধে যখম হওয়ার চিহ্ন, তাঁর আসহাবদের মধ্যে বোধ হয় একটা লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না যার গায়ে অস্ত্রের আঘাত ছিল না, বহু সাহাবী ছিলেন যাদের সমস্ত শরীর অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নে ভরপুর ছিল। ঐ সুন্নাহ হলো সেই একমাত্র জান্নাতি ফেরকার সুন্নাহ। বাকি বাহাত্তর ফেরকার সুন্নতীদের সারা গায়ে সুঁচের দাগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা 'দীনুল কাইয়্যেমা'কে সমস্ত পৃথিবীতে কার্যকরী করে মানব জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম (জেহাদ) ও সশস্ত্র সংগ্রাম (কিতাল) করার যে সুন্নাহ বিশ্বনবী ও তাঁর সঙ্গীরা (রা.) রেখে গেছেন সেই সুন্নাহকে বুঝিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যার উপর আমি ও আমার সঙ্গীরা আছি এবং এও বলেছেন যে, যারা এই সুন্নাহ ছেড়ে দেবে তারা আমাদের কেউ নয় অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী নয়। মহানবীর আসহাব যে নিঃসংশয়ে

বুঝতে পেরেছিলেন কোনটা তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ, তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে সেই উম্মতে মোহাম্মদীর ইতিহাস; তা পেছনে বলে এসেছি। এখন যিনি আল্লাহর রসুলের রেসালাতের পর এই জাতির হাল ধরেছিলেন সেই আবু বকরের (রা.) একটা কথা উল্লেখ করছি। জাতির খলিফা নির্বাচিত হয়ে তার প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি বললেন, "মুসলিমরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জেহাদ পরিত্যাগ না করে। কোনো জাতি একবার জেহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ সে জাতিকে অপদস্থ-অপমানিত না করে ছাড়েন না"। বিশ্বনবীর ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী (সাহাবা) তার সর্ব রকম বিপদ-আপদে সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী- নবীর জীবিতকালেই যাকে উম্মতে মোহাম্মদীর নামাযে এমামতি করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল- সেই আবু বকর (রা.) কি মহানবীর কাছে থেকে ইসলাম-ইসলামের মর্মবাণী-প্রকৃত সুন্নাহ-এসব কি শিক্ষা করেন নি? নিশ্চয়ই করেছিলেন এবং শুধু আবু বকর (রা.) নন, বিশ্বনবীর প্রত্যেক সাক্ষাৎ-সঙ্গীরা করেছিলেন। আবু বকরের (রা.) মত তারাও জানতেন তাদের নেতার প্রকৃত সুন্নাহ কোনটা, তাই তাদের শেষ মানুষটা বেঁচে থাকা পর্যন্ত ঐ জেহাদ চালিয়ে গেছেন। আবু বকরের (রা.) ঐ সাবধান বাণী কতখানি সত্য ছিল তা ইতিহাস। যতদিন এই জাতি একাগ্র লক্ষ্যে (হানিফ) ঐ সুন্নাহ অর্থাৎ জেহাদ চালিয়ে গেল ততদিন আল্লাহ স্বয়ং তাদের অভিভাবক হয়ে তাদের সঙ্গে রইলেন। তা না থাকলে তাদের ঐ অবিশ্বাস্য বিজয় অসম্ভব ছিল। তারপর ৬০/৭০ বছর পর যখন এই জাতি ঐ জেহাদ বন্ধ করল, তখন সংখ্যায় তারা প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশি, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক তাদের দখলে। হলে কি হবে? জেহাদ ছাড়া অর্থ বিশ্ব নবীর সুন্নাহ ছাড়া, অর্থাৎ উম্মতে মোহম্মদী হতে বহিষ্কার। কারণ তিনি তো বলেই দিয়েছেন, যে আমার সুন্নাহ ছাড়লো সে আমাদের কেউ নয়। আবু বকর (রা.) বলেছিলেন 'জেহাদ ছাড়লে আল্লাহ অপদস্থ অপমানিত করবেন'। দেখা গেল আবু বকর (রা.) অনেক কম বলেছিলেন। কারণ আল্লাহ শুধু অপদস্থ-অপমানিতই করলেন না, তিনি শত্রুদের দিয়ে নবীর ব্যক্তিগত অভ্যাসের সুন্নাহ পালনকারী এবং উম্মতে মোহাম্মদীর দাবীদার এই বিরাট জাতিটাকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মেশিন গান করে, ট্যাংকের তলায় পিষে, জীবন্ত কবর দিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, বেয়নেট করে, আগুনে পুড়িয়ে, তাদের মেয়েদের আফ্রিকা আর ইউরোপের বেশ্যালয়ে বিক্রি করিয়ে এবং তারপরে তাদের ঘৃণিত ক্রীতদাসে পরিণত করে দিলেন। এই সময়ের ইতিহাস পড়লে মনে হয় আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ করার, দীনের অতি বিশ্লেষণ করে জাতিকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার, এক বহির্মুখী গতিকে উল্টিয়ে অন্তর্মুখী করে দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে শেষ করে দেওয়ার শাস্তি দিতে তার গজবের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সে শাস্তির ইতিহাস পড়লে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। ভুললে চলবে না যে যখন এই লোমহর্ষক শাস্তি আল্লাহ এই জাতিকে দিয়েছিলেন তখন এই জাতির আইন-কানুন-বিচার-দণ্ডবিধি ইত্যাদি সবই কোর'আন-হাদিস মোতাবেক অর্থাৎ জাতি তখনও উম্মতে মোহাম্মদী না হলেও মুসলিম। কিন্তু আল্লাহ তাও পরোয়া করলেন না। আর আজ তো তাও নেই, ওগুলোও তো গায়রুল্লাহর মানুষের তৈরি, যেগুলো ধ্বংস করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মতে মোহাম্মদীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই জাতি সেই কুফর ও শেরককে গ্রহণ

করেও, সেই মোতাবেক জাতীয় জীবন চালিত করেও নবীর কতকগুলি অপ্রয়োজনীয়-নিরাপদ নেহায়েত ব্যক্তিগত অভ্যাসকে অতি নিষ্ঠার সাথে নকল করে নিজেকে অতি উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী ভাবছে। কী পরিহাস, কী হাস্যকর।

রসুলাল্লাহর প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ এই দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে তার উম্মাহ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া ছাড়াও আরও বহু ক্ষতি হয়েছে। শুধু তাদের নয়, সমস্ত মানব জাতির মহা ক্ষতি হয়েছে। কেমন করে তা বলছি। পরিবার পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ি এমন কি দেশ ত্যাগ করে অর্থাৎ ইসলামের সন্ন্যাস (হাদিস- ইসলামে সন্ন্যাস নেই; ইসলামের সন্ন্যাস জেহাদে ও হজ্বে) গ্রহণ করে মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পৃথিবীতে এই শেষ দীন প্রতিষ্ঠা করার পর যখন এই উম্মাহ তার নেতার সুন্নাহ ছেড়ে দিলো- তখন তারা এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী যে তাদের বাঁধা দেবার মত তখন আর কেউ নেই। তখন যদি তারা না থামতেন তবে সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানব জাতির জীবন থেকে সমস্ত অন্যায়-অবিচার-অশান্তি-রক্তপাত বন্ধ হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরপুর হয়ে যেতো। তাদের ঐ থেমে যাওয়ার ফলে মানব জাতির মধ্যে যত অশান্তি-অন্যায়-অবিচার-যুদ্ধ-রক্তপাত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে তার জন্য দায়ী তারা যারা নবীর ঐ প্রকৃত সুন্নাহ পরিত্যাগ করেছিলেন। গতিশীলতা (Dynamism) হারিয়ে জাতি যখন স্থবির হয়ে গেল তখন স্বাভাবিকভাবেই তাতে জাতি-ধ্বংসকারী বিষ জন্মানো আরম্ভ হলো। পানির স্রোত যতক্ষণ বইতে থাকে, চলমান থাকে ততক্ষণ পানি তাজা থাকে। স্রোত বন্ধ হয়ে গেলেই পানিতে পচন ধরে বিষ জন্মায়। সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে গতিহীন স্থবির হবার পরই পচন ধরলো, সে পচন হলো দীনের অতি বিশ্লেষণ, যেটার কথা বিশ্বনবী বলে গিয়েছিলেন- 'অতি বিশ্লেষণ করো না, পূর্ববর্তী উম্মাহগুলির মত ধ্বংস হয়ে যাবে"। দ্বিতীয় পচন হলো ভারসাম্যহীন বিকৃত সুফিবাদের অনুপ্রবেশ, যেটা ঐ গতিশীলতার ঠিক বিপরীত, যেটা জাতির আকিদা উলটিয়ে পেছন দিকে মুখ করে দিলো। বিশ্বনবীর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বকে যারা মাঝপথে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, তারা আল্লাহর দেওয়া বিশ্বনবীর উপাধি, 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' কেও পূর্ণ হতে দেন নি; অর্থাৎ তিনি এখনও 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' হন নি। ব্যাখ্যা করছি- 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' শব্দের অর্থ হলো (পৃথিবীর) জাতি সমূহের উপর (আল্লাহর) রহমত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি। কোথায় সে রহমত? পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি, হাহাকার, অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, বুক ভাংগা দুঃখ। মানুষের ইতিহাসে বোধহয় একত্রে একই সঙ্গে দুনিয়ার এত অশ্রু, এত অশান্তি কখনো ঘটে নি। নবী করিমের আগেও বোধহয় পৃথিবীর একখানে অশান্তি থাকলে অন্যখানে খানিকটা শান্তি থাকতো। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ পৃথিবী ছোট, আজ একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে রক্তারক্তি-অশান্তি হচ্ছে তা ইতিহাসে বোধহয় আর কখনো হয় নি।

তর্ক যাদের অভ্যাস তারা হয়ত আমার একথা মানবেন না। বলবেন এর আগে যে হয় নি সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হব কেমন করে, কারণ অতীতে মানুষ এক জায়গার খবর অন্য জায়গায় পেতো না।

ঠিক কথা, মানছি আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু একটা কথায় আমি নিশ্চিত এবং আশা করি ঐ তার্কিকরাও নিশ্চিত হবেন যে, ইতিহাসে ত্রিশ বছরের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করে ষোল কোটি মানুষ এবং তারপর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ছয় কোটি মানুষ এত কম সময়ের মধ্যে কখনই হতাহত হয় নি। এত অন্যায়ও মানুষের ইতিহাসে আর কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। তার চেয়েও বড় কথা, মানব জাতি আণবিক যুদ্ধ করে আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা আজকের, বর্তমানের। রসুলাল্লাহর পৃথিবীতে আসার চৌদ্দশ' বছর পর। তাহলে তিনি কেমন করে পৃথিবীর মানুষের জন্য রহমত? এর জবাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে যে জীবনব্যবস্থা, দীন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই দীন মানব জাতির উপর সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করলে যে শান্তি, সুবিচার, নিরাপত্তা মানুষের জীবনে নেমে আসবে সেটা হলো আল্লাহর রহমত, তাঁর দয়া। কারণ তিনি ঐ জীবনব্যবস্থা না দিলে মানুষ কখনই তা নিজেরা তৈরি করে নিতে পারত না, যদি করত তবে তা সীমাহীন অশান্তি আর রক্তপাত ডেকে আনতো, যেমন আজ করছে। সেই জীবনব্যবস্থা, দীন, সংবিধান তিনি যার মাধ্যমে মানুষকে দিলেন তাঁকে তিনি উপাধি দিলেন রহমাতুল্লিল আলামিন। কিন্তু যতদিন না সমগ্র মানব জাতি নিজেদের তৈরি জীবনব্যবস্থা সমূহ পরিত্যাগ করে মোহাম্মদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করবে ততদিন তারা সেই অশান্তি, অন্যায় (ফাসাদ) ও যুদ্ধ, রক্তপাতের (সাফাকুদ্দিমা) মধ্যে ডুবে থাকবে, আজকের মত এবং ততদিন বিশ্বনবীর ঐ উপাধি অর্থবহ হবে না, অর্থপূর্ণ হবে না এবং আজও হয় নি। তাঁর উম্মাহ ব্যর্থ হয়েছে তাঁর উপাধিকে পরিপূর্ণ অর্থবহ করতে। তবে ইনশাল্লাহ সেটা হবে, সময় সামনে। স্রষ্টার দেওয়া উপাধি ব্যর্থ হতে পারে না, অসম্ভব। এ ব্যাপারে সম্মুখে আলোচনা করব।

কার্লমার্কস, কমিউনিজম বলে একটি জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন। এটাও একটা দীন এবং অবশ্যই এই আশা নিয়ে যে তাঁর অনুসারীরা একে সমস্ত পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা করতে সর্বরকম সংগ্রাম করবে। তাঁর অনুসারীরা তা করেছেও। অর্থনৈতিক অবিচার, অন্যায়কে শেষ করে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা অসীম ত্যাগ, সাধনা, সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ বা ভবিষ্যতে যদি কমিউনিস্টরা তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে কার্ল মার্কসের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলিকে অনুকরণ করতে থাকে তবে মার্কস কি তাদের অনুসারী কমিউনিস্ট স্বীকার করবেন? এই প্রশ্নটাই করেছিলাম একজন উৎসর্গকৃত প্রাণ যুবক কমিউনিস্ট কর্মীকে। বলেছিলাম 'আচ্ছা বলতো! ভবিষ্যতে কখনো মার্কস কবর থেকে উঠে এসে যদি দেখেন যে, তোমরা কমিউনিজমকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয়, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই পুঁজিবাদকে তোমরা গ্রহণ করেছ, তোমাদের সংবিধান বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনে পাশ্চত্যের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছ, কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তোমরা কমিউনিজম বিশ্বাসী, তোমরা মার্কসের মত চুল দাড়ি রাখ, তার মত হ্যাট পড়ো, তার মত কাপড় পড়ো, মার্কস যে কাতে ঘুমাতেন তোমরাও সেই কাতে শোও, যেভাবে দাঁত মাজতেন সেইভাবে

মাজ, হাতে কাস্তে হাতুড়ী মার্কা ব্যাজ পড়, সুর করে দ্যাস ক্যাপিটাল পড় এবং কে কত সুন্দর সুর করে তা পড়তে পারে তার প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দাও এবং এসব করে সত্যি বিশ্বাস কর যে তোমরা অতি উৎকৃষ্ট কমিউনিস্ট এবং মার্কসের বিশ্বস্থ অনুসারী- তবে মার্কস কি করবেন? কমিউনিস্ট কর্মীটি অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তা কী করে সম্ভব? আমাদের কমিউনিস্ট বলেই স্বীকার করবেন না। আমরা যদি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রই গ্রহণ করি তবে আমরা আর কমিউনিস্ট রইলাম কি করে? বললাম, ধরে নাও না তাই করলে, করলে মার্কস কি করবেন? একটু চিন্তা করে সে বলল, আমাদের কমিউনিস্ট বলেই স্বীকার করবেন না। 'আমাদের গায়ে থুথু দেবেন'। অনুরূপ অবস্থায় মহানবী কি করবেন তা আমাদের কষ্ট করে অনুমান করতে হবে না। কারণ সে কথা তিনি আমাদের আগেই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের আগে আমি হাউসে কাওছারে পৌঁছব, আমার সামনে দিয়ে যারা যাবে তারা পানি পান করবে এবং যারা পান করবে তারা আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। লোকজন যাদের আমি চিনি এবং যারা আমায় চেনে পানি পান করার জন্য আমার কাছে আসবে কিন্তু তাদের ও আমার মধ্যে বাধা-ব্যবধান সৃষ্টি করা হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার লোক। বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পর এরা কি বেদা'ত করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হও, দূর হও, যারা আমার পর বেদা'ত করেছ (সহল বিন সা'দ (রা.) থেকে- বোখারি, মুসলীম, মেশকাত-মুসনাদ আহমদ ইত্যাদি) এই অনেকটা শাব্দিক অনুবাদকে সহজ ভাষায় বললে এই দাঁড়ায়- আল্লাহর রসুল সবার আগে হাউসে কাওসারে পৌঁছে যাবেন, তারপর তার উম্মাতের মানুষ তার সামনে দিয়ে যেতে থাকবে আর তিনি তাদের কাওসারের পানি পান করাতে থাকবেন, যে পানি পান করলে মানুষ আর কখনও তৃষ্ণার্ত হয় না। এর মধ্যে এমন একদল মানুষ আসবে যারা কাওসারের পানি পান করতে অগ্রসর হলেও রসুলাল্লাহ ও তাদের মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে। তখন তিনি বলবেন, এরাতো আমার লোক অর্থাৎ আমার উম্মত। তখন বলা হবে অর্থাৎ আল্লাহ বলবেন, আপনি জানেন না আপনার পর আপনার উম্মাহর ঐসব লোক আপনি যে দীন রেখে এসেছিলেন তার মধ্যে কি কি বেদা'ত করেছে। এই কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝে বিশ্বনবী ঐ সমস্ত লোকদের বলবেন, দূর হও! দূর হও! যারা আমার পর দীনে বেদা'ত করেছ। অর্থাৎ মহানবী তাঁর উম্মাহর ঐ লোকদের ভাগিয়ে দেবেন, তাদের কাওসারের পানি পান করতে দিবেন না, কারণ তারা বেদা'ত করেছিল। আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে যে দীন, জীবনব্যবস্থা মানব জাতিকে দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ, তাতে কোনো কিছু নতুন সংযোজন হলো বেদা'ত। এই বেদা'তকে, সংযোজনকে মহানবী শেরক বলেছেন, কারণ এটা করা মানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা, এবং প্রকারান্তরে বলা যে আল্লাহর দীন পূর্ণ নয়। শুধু নতুন সংযোজনই যদি শেরক হয়, যে শেরক আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন মাফ করবেন না বলে, তবে শুধু সংযোজন নয়, দীনের সর্বপ্রধান অর্থাৎ জাতীয় ভাগটিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি বর্জন করে সেখানে ইউরোপের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি ব্যবস্থা জীবনে প্রয়োগ করে রসুলের ব্যক্তিগত সুন্নাহগুলি পালন করে যারা নিজেদের উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করে

আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবে আছেন তাদের কি অবস্থা হবে? প্রত্যেক নবীর (আ.) একটি করে হাউজ থাকবে এবং তারা প্রত্যেকে যার যার উম্মাহকে কেয়ামতের দিনে তা থেকে পানি পান করাবেন। আমাদের প্রিয় নবীও তাঁর হাউজে কাওসার থেকে তাঁর উম্মাহকে পানি পান করাবেন। আল্লাহ যখন নবীকে বেদা'তকারীদের পানি পান করাতে বাধা দেবেন তখন বোঝা গেল তারা আর নবীর উম্মত নয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তারা অবশ্যই তার উম্মত ছিল, নইলে মহানবী প্রথমে একথা কেন বলবেন যে, ওরাতো আমার লোক, অর্থাৎ আমার উম্মত। ঐ লোকগুলি আজকের "উম্মতে মোহাম্মদী"। দৃশ্যত এত উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল পর্যন্ত প্রায় ধোকায় পতিত হবেন। আল্লাহ বাধা না দিলে তো কাওসারের পানি পান করিয়েই দিতেন। বিশ্বনবী যখন তাদের 'দূর হও, দূর হও' বলে ভাগিয়ে দিবেন তখন অবশ্যই একথা পরিষ্কার যে তাঁর উম্মাহ থেকেই ভাগিয়ে দেবেন। কাপড়ে চোপড়ে, চলাফেরায়, কথাবার্তায়, খাওয়া দাওয়ায়, শোয়ায় তারা উৎকৃষ্ট সুন্নাহ পালনকারী কিন্তু আসলে বেদা'ত ও শেরকে নিমজ্জিত। যাত্রাদলের কাঠের বন্দুক দেখতে একদম বন্দুক, কিন্তু তা থেকে গুলি বের হয় না। এরা নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছেন, অন্যকে ফাঁকি দিচ্ছেন এবং কেয়ামতে আর একটু হলেই একেবারে স্বয়ং নবীকেই ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি!

মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর যে সংজ্ঞা দিয়ে এলাম এর শেষ কথা এই যে, মো'মেন ও মুসলিম আদম (আ.) থেকে প্রত্যেক নবীর সময়ই ছিল কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদী শুধু শেষ নবীর পর থেকে। এই উম্মাহর একমাত্র শাফায়াতকারী তিনি। তিনি যদি আমাদের তাঁর উম্মাহ বলে স্বীকার না করেন, দূর হও! দূর হও! বলে তাড়িয়ে দেন। তবে জাহান্নাম ছাড়া আমাদের আর কোনো জায়গা নেই।

কল্পনায় উম্মতে মোহাম্মদীকে বর্তমানে নিয়ে আসা

কল্পনা করা যাক যে ছোট্ট জাতিটি, যার মোট জনসংখ্যা চার পাঁচ লাখের বেশি হবে না, বিশ্বনবীর সঙ্গে থেকে তাঁকে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে জানমাল দিয়ে সাহায্য করল তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর কাছ থেকে সরাসরি এই দীন শিক্ষা করল, ঐ দীনের প্রাণ কোথায়, দেহ কোথায়, উদ্দেশ্য কী, সেই উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রক্রিয়া কী এসব বুঝল এবং হৃদয়ঙ্গম করল এবং তাঁর পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর তাদের নেতার আনা জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সব কিছু ছেড়ে বের হয়ে পড়ল ও তদানিন্তন দুনিয়ার দুইটি মহাশক্তিকে এক এক করে নয় একই সঙ্গে পরাজিত করে আটলান্টিকের উপকূল থেকে চীন সীমান্ত পর্যন্ত এই দীন প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করল, এক মহা সভ্যতার জন্ম দিল- এই জাতিটাকে যদি কোনো মন্ত্র বলে আজকের

পৃথিবীকে কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়ে আনা যায় তবে কি হবে? ঠিক কি হবে তা সম্পূর্ণ করে কেউ বলতে পারবে না, তবে কয়েকটি জিনিস যে হবে তা অনুমান করা যায়।

প্রথমত তারা বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে বর্তমান পৃথিবীটাকে দেখবেন এবং আমাদের যখন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে তাদের উত্তরসূরী বলে তখন আমরা বর্তমান দুনিয়াটা তাদের ঘুরিয়ে দেখাবো। আমাদের কোটি কোটি টাকার জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদগুলো দেখে তারা চোখ বড় বড় করে বলবেন, সুবহান আল্লাহ, আমাদের খেজুর পাতার ছাদ আর মাটির মেঝের মসজিদগুলোর চেয়ে তোমাদের মসজিগুলি কত সুন্দর, কত শান-শওকতওয়ালা। তারা প্রশ্ন করবেন, তোমরা এখন পৃথিবীতে সংখ্যায় কত? আমরা বুক ফুলিয়ে জবাব দেব তা প্রায় একশ ষাট কোটির মত। তারা বিস্মিত হয়ে বলবেন, মাশাআল্লাহ, কিন্তু আমরা চার পাঁচ লাখ হয়ে ৬০/৭০ বছরের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আর চৌদ্দশ বছর হয়ে গেল তোমরা একশ ষাট কোটি হয়েও তার চেয়ে বেশি এগুতে পারো নি দেখছি। আমরা তাদের সামনে গত বারশো বছরে যে সব জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বই কেতাব লিখেছি তা রাখতে আরম্ভ করব। ক্রমে ক্রমে তা পর্বতের চেয়ে উঁচু হয়ে যাবে। শেষে ঐ চার পাঁচ লাখ মানুষ ঢাকা পড়ার উপক্রম হলে তারা ভয়ে চেচিয়ে উঠবেন, থামো থামো। এগুলো কিসের বই? আমরা আবারও বুক ফুলিয়ে জবাব দেব, এক কথায় এর জবাব দেয়া সম্ভব নয়। একটা পাহাড় সমান কেতাবের স্তুপ দেখিয়ে বলব- এগুলো হচ্ছে ফিকাহ। তারা বিস্মিত হয়ে বলবেন ফিকাহ? এ এত বিরাট হলো কি করে? ফিকাহকে আমরা কেমন করে কত পরিশ্রম করে এত বিরাট করেছি তা তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবার পর তারা প্রশ্ন করবেন, ঐ স্তূপগুলো কি? আমরা বুঝিয়ে দেব ওগুলো হাদিসের কেতাব। তারা আবার বিস্মিত হয়ে বলবেন, মাশাআল্লাহ! এতো হাদিস তোমরা সংগ্রহ করেছ। আমাদের তো হাদিসের কোনো বইই ছিল না। ঐগুলি কি? আমরা তাদের অজ্ঞতা দেখে করুণা করে তাদের বুঝিয়ে দেব, ঐ বইয়ের পর্বত হচ্ছে কোর'আনের তফসীরের, ঐ পর্বত হচ্ছে দীনিয়াতের, ঐ পাহাড় উসুলে ফিকাহর, ঐ পাহাড় উসুলে হাদিসের, ঐ পর্বত মসলা মাসায়েলের, ঐ পর্বত তাসাওয়াফের, ঐ পাহাড় কিয়াসের, ঐ পর্বত ইজমার, এই পাহাড়... এই পর্যন্ত বলতেই তারা ভয় পেয়ে বলবেন, ব্যস! আর দরকার নেই। আমরা এগুলোর কোনটা সম্বন্ধে জীবনেও শুনি নাই। আমাদের মাত্র একটা বইই ছিল কোর'আন, তাও মাত্র কয়েকটি কপি। আর আমাদের মধ্যে পড়তে পারতেন মাত্র কয়েকজন, তারা পড়তেন আমরা শুনতাম আর তা কাজে পরিণত করতাম। যাই হোক, তোমরা আমাদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিলে যে, ফিকাহ কী জিনিস, কোর'আনের আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা করিনি। কারণ এতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আল্লাহর রসুল নিষেধ করে দিয়েছেন, বলেছেন এ কোর'আন মুবিন, পরিষ্কার, সকলের সহজবোধ্য। রসুলাল্লাহও কোর'আনের ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তরকে একেবারে কুফর বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। যাই হোক, এত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা আর পাণ্ডিত্যের পর তোমাদের জীবনে তাহলে কোর'আনের আইন আমাদের জীবনের চেয়ে আরও ভালো প্রভাব প্রতিফলন নিশ্চয়ই হয়েছে? তোমরা

আমাদের চেয়ে আরও ভালো মুসলিম হতে পেরেছ। কিন্তু তাহলে এ দেড় হাজার বছর পরেও কেন তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে পার নি? ও ভালো কথা! এ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখছি তোমরা নিকৃষ্টতম জাতি, অন্যান্য জাতির ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র। ওদের ধার, ঋণ, আর খয়রাতের উপর তোমরা বেঁচে আছ। আল্লাহ বলেছেন আমরা যদি তাঁকে একমাত্র প্রভু স্বীকার করে তাঁর আদেশ নিষেধকে, তাঁর দীনকে পৃথিবীর মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করি তবে তিনি আমাদের পৃথিবীর সবার উপর আধিপত্য দেবেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি করে রাখবেন (সুরা আন-নূর-৫৫)। আমরা সরাসরি তাই করেছিলাম, কোনো ব্যাখ্যায় যাই নি। কারণ তাঁর দেখানো পথ সেরাতুল মোস্তাকীম- সহজ, সরল। তাঁর প্রতিশ্রুতি যে সত্য তাতো আমরা দেখলামই। আমাদের তিনি শ্রেষ্ঠ জাতিতেই পরিণত করেছিলেন। কিন্তু আমরা একটা কথা বুঝতে পারছি না তোমরা এত উন্নতি করে এত ভালো মুসলিম হলে কিন্তু পৃথিবীতে তোমাদের এ অবস্থা কেন?

এইবার আমাদের ফুলানো বুকগুলি চুপসে যাবে। মুখগুলি কাচুমাচু হয়ে যাবে। আমতা আমতা করে বলব, যদিও কোর'আনের হাদিসের আইন শরীয়াহ নিয়েই আমরা এতো সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি, এ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বিরাট শাস্ত্র গড়ে তুলেছি, ওটা করে আমাদের মধ্যে বহু মাযহাব ও ফেরকা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মারামারিও হচ্ছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ও আইন, শরীয়াহ আমরা জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়েছি, জাতীয় জীবনে আমরা এখন পাশ্চাত্যের আইন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচার ও দণ্ডবিধি গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করেছি। আপনারা কিছু মনে করবেন না, জাতীয় জীবনে আল্লাহর আইন ইত্যাদি চালু করলে পাশ্চাত্যের সভ্য জাতিরা হাসবে, আমাদের অসভ্য ভাববে। কিন্তু তাই বলে আমাদের খারাপ মুসলিম ভাববেন না, আমরা খুব নামাযী, আমাদের মসজিদে জায়গা পাওয়া যায় না, আমাদের মধ্যে বহুলোক নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়েন, আমরা রমযানের রোযা রাখি, হজ্ব করি এবং অনেকেই যাকাত দেই। শুধু তাই নয়, আমাদের মধ্যে বড় বড় পীর ফকীর আছেন, তারা তাসাওয়াফের কঠিন রেয়াযত করেন এবং আমাদের কোটি কোটি লোক তাদের মুরীদ আছেন। শুধু তাই নয়, আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্ব এজতেমা করি। জাতীয় জীবন থেকে আল্লাহ রসুলের আইন কানুন বাদ দিলেও ব্যক্তি জীবনে আমরা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করি। আমাদের বক্তব্য শোনার পর তারা বলবেন, এইবার আসল কথা বুঝালাম। আমরা তো তোমাদের অসংখ্য বই পত্তর, আলীশান মসজিদ, তোমাদের বিরাট বিরাট মাহফিল এজতেমা দেখে ভেবেছিলাম মুসলিম জাতি আমাদের সময়ের চেয়ে কতো প্রগতি করেছে, আমাদের তো তোমাদের সামনে নিজেদের মুসলিম বলতে লজ্জাই করছিল। কিন্তু এখন বুঝলাম তোমরা আর আমরা এক জাতি, এক উম্মাহই নই। যে আল্লাহর আইন, জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে অন্যায়, অশান্তি, অবিচার, রক্তপাত বন্ধ করতে, ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করতে আল্লাহর রসুল ও আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সংগ্রাম করেছিলাম, আল্লাহর সেই আইনকেই, সেই জাতীয় জীবনব্যবস্থাকেই তোমরা বর্জন করে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি আইন ও জীবনব্যবস্থা তসলিম করে নিয়েছ। তোমরা তো মোশরেক- আল্লাহর

অংশীবাদী। জানিনা, কোন্ মন্ত্রবলে আমাদের তোমরা ক্ষণকালের জন্য তোমাদের এই যুগে নিয়ে এসেছ। কিন্তু নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি যে, আমাদের সঙ্গে যদি আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বিশ্বনবীকে আনতে পারতে তবে তিনি এখনই আমাদের আদেশ দিতেন তোমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে। ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ বিশ্বাসী তো আরবের মোশরেকরাও ছিল, খ্রিষ্টান আর ইহুদিরাও ছিল তোমাদের মত। জেহাদ করেছিলাম তো জাতীয় জীবনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য। চললাম, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন একথাও বলতে পারছি না। কারণ আল্লাহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, তিনি ইচ্ছা হলে সমস্ত রকম গুনাহ মাফ করবেন কিন্তু শেরক ক্ষমা করবেন না (সুরা আন-নিসা-৪৮)। তোমরা বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো দিচ্ছ আল্লাহ তোমাদের পথ প্রদর্শন করুন, হেদায়েত করুন।